বেণীসংহার   দ্বিতীয় পর্ব

বেণীর শ্রমিকরা যদিও শ্রীসিংহানিয়ার অতীত ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে কিছু কিছু অবহিত ছিলেন, কিন্তু শ্রমিক নেতাদের প্রগাঢ় মালিকপ্রীতি ছিলো, তাঁরা শ্রীসিংহানিয়া মহাশয়কে ক্রমাগত আধুনিক শিল্পপতি বলে চালিয়ে গেছেনা কিন্তু শ্রীসিংহানিয়া মহাশয়ের অমর কীর্তিসমূহ আম্লান-অক্ষয় হয়ে এই বাংলায় সতত বিরাজমান। একটা ছোটো উদাহরণ দিয়ে হাঁড়ির একটা টিপে বাকি ভাতগুলোর হালহকিকৎ বোঝার চেষ্টা করা যাক।

বেণীর মতো ক্যালক্যাটা ফ্যান সংস্থাও কালক্রমে আইনমাফিক 'লিকুইডেসন'-এ যায় এবং শ্রী সিংহানিয়া সেই সংস্থাটি কিনে নেনা এই সংস্থাটি গুটিয়ে নেওয়ার আদেশে সই দেন একসময়ের বিখ্যাত ন্যায়াধীশ মহামান্য শ্রী উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ন্যায়াধীশ শ্রী সিদ্ধেশ্বর নারায়ণা সেই বিখ্যাত দিনটি ছিলো ১৯৯৪ সালের এপ্রিল ১০। শ্রীসিংহানিয়া অনেকটা জমিসহ ক্যালক্যাটা ফ্যান সংস্থা কিনে নেন মাত্র ১.৪১ কোটি টাকায়। শ্রীসিহাংনিয়ার এখানেও আসল উদ্দেশ্য ছিলো কারখানার জমিকে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা। এখানেও বেণীর মতো কেনা জমি পড়েল রইলো অনেককদিন; প্রায় চার বছর, জমির ফাটকাবাজিতে জমির দর উর্দ্ধমুখী হওয়ার পরই মাত্র সিংহানিয়া সাহেব নড়েচড়ে বসলেন। শীতঘুম ভাঙার আর একটা কারণ অবশ্য ছিলো এই যে ইতিমধ্যে কলকাতা আদালতের মহামান্য বিচারপতি শ্রী সিনহা একটি আদেশবলে শ্রীসিংহানিয়ার পক্ষের বরিষ্ঠ আইনজীবী প্রয়াত শ্রী অজিত কুমার পাঁজা মহাশয়কে নির্দ্দেশ দেন যে তিনি যেন বন্ধ হয়ে থাকা ক্যালক্যাটা ফ্যান-এর শ্রমিক সঙ্গে একসঙ্গে বসে 'কী ভাবে এই সংস্থাটিকে পুনরায় খোলা যায় এবং সমস্ত শ্রমিককে পুনরায় কাজে ফিরিয়ে নেওয়া যায়' সে বিষয়ে শ্রী পাঁজা মালিকের মত নিয়ে একটি পদ্ধতি স্থির করেন। এটি ছিলো আদালতের আদেশ। শ্রী পাঁজাকে মহামান্য আদালত চার সপ্তাহের সময় দেয়। বলাই বাহুল্য, ১৮ মাসের বছর গড়িয়ে গেলেও বিষয়টি এমনকি

শামুকের গতিতেও সিকি কদমও এগোয়নি। ইতিমধ্যে জনতার যে 'প্রোভারবিয়াল' 'সম্মিলিত' বিস্মৃতি সুবিদিত, তার কবলে পড়ে ক্যালক্যাটা ফ্যান এখন গভীর অতীতের এক অপরিচিত কাহিনীর সারণীতে আরও অনেক মরা অতীতের তীরে তার স্থান খুঁজে নিয়েছে। 'শ্যাম-কম্বোজে ওংকারধাম'-এর 'প্রাচীন কীর্তি'-র গুণগানে সত্যেন্দ্রনাথ যেমন মুগ্দ্ধ ও বিমোহিত, আমরাও তেমনি শ্রীসিংহানিয়ার জে জে স্টীল-এর ঘটনায় চমৎকৃত, তবে এই বিষয়ে 'রেকারিং ডেসিমেলের' মতো তদন্তকার্য চলমান, আমার মৃত্যুর পূর্বে অঘটন কিছু ঘটলে জানানোর চেষ্টা করা যাবেখন। কেউ ভোলে না কেউ ভোলে, অতীত দিনের স্মৃতি - রাজনৈতিক নেতাদের টুপাইস দিয়ে পকেটে পুরে চালু এবং বন্ধ কারখানার প্রহর শেষের রাঙা আলোয় সেদিন এবং আজও সর্বনাশ করার ললিত কলায় শ্রীসিংহানিয়ার দক্ষতা প্রবাদপ্রতিম - বেণীর ক্ষেত্রেও আমরা এই বিষয়টি দেখবো একটু পরে।

কলকাতার শ্রমিকদের দুর্দশা নিয়ে কর্মরত একটি নাগরিক সংস্থা, নাগরিক মঞ্চ (এটি একটি পুরোনো সংস্থা, সাম্প্রতিক কালে 'গজিয়ে ওঠা' এই একই নামের সংস্থাটির সঙ্গে এই নাগরিক মঞ্চের কোনো সম্পর্ক নেই), কোলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, ন্যায়াধীশ শ্রী রাজেন্দ্র সাচার, বর্তমানে সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী (এবং আফজল গুরু মামলার উকিল) এবং আরও অনেক বিশিষ্ট মানুষদের নিয়ে 'প্লাইট অফ ওয়ারকারস' নামে তিন দিনের একটি নাগরিক তদন্ত কমিশন চালায়। সময়টা ছিলো ১৯৯৭-এর ২৭ থেকে ২৯-এ জুন - তখন আক্ষরিক অর্থেই মালিকরা 'অফেন্সিভ'-এ, আর শ্রমিকরা কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলোর 'সফল নেতৃত্বে' 'ডিফেন্সিভ'-এ, একেবারে দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে। নয়া শিল্পনীতি বামফ্রন্ট গ্রহণ করেছে (তখনও উন্নততর বামফ্রন্ট এবং সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম দুরস্ত)। এই কমিশনে বেণীর দুজন শ্রমিক একটি পিটিশন জমা দেন। সেই পিটিশনের শুনানীর শেষে প্রাক্তন বিচারপতি শ্রী সাচার মন্তব্য করেন: ' কোম্পানিটির ক্রেতা

তার চুক্তি অনুসারে কাজ করছে না এবং এটি আদালত অবমাননার সমতুল্য। শ্রমিকরা কোলকাতা উচ্চন্যায়ালয়ে আদালত অবমাননার বিষয়ে মামলা করতে পারে।' পরে নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে বেণীসহ অন্যান্য যে সমস্ত কারখানার দুর্দশা নিয়ে এই তদন্ত কমিশন হয়েছিলো, তা নিয়ে 'প্লাইট অফ ওয়ারকারস' নামে একটি প্রমাণ্য পুস্তকও প্রকাশ করা হয়। এই প্রকাশনাটিকে ভিত্তি করে ১৯৯৮-এর ১৫ ই এপ্রিল-এ তিনজন আইনজীবী কোলকাতা হাইকোর্টে বেণীর মালিকের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন - অভিযোগ ছিলো আদালত অবমাননার। এই আবেদনে প্রমাণসহ বলা হয় যে এই কারখানা সম্পর্কে আদালতের স্পষ্ট নির্দ্দেশ ছিলো কারখানা সত্ত্বর চালু করার, কিন্তু ক্রেতা সংস্থা তো তা করেই নি, উল্টে আদালতের সমস্ত আদেশ লঙ্ঘন করে শ্রী সিংহানিয়ার সংস্থা, রত্নাগিরি ইঞ্জেইয়ারিং কারখানার সব যন্ত্রপাতি নিয়ে চম্পট দিয়েছে। কোলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রী সুজিত কুমার সিনহা মহাশয় বিষয়টিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে পরের দিন, অর্থাৎ এপ্রিল ১৬, ১৯৯৮ এ এই মামলাটি পুনরায় শোনার আদেশ দেন। এই মামলার প্রেক্ষিতে মহামান্য কোলকাতা আদলতের মাননীয় বিচারপতি শ্রী সুজিত কুমার সিনহা মহাশয় ১৯৯৮ সালের এপ্রিল ১৬ শ্রমিকদের পক্ষের আইনজীবীদের বক্তব্য শোনেন। এই আইনজীবীদের মূল বক্তব্য ছিলো এই যে শ্রীসিংহানিয়া কারখানাটি একটি চালু কারখানা হিসেবে কিনেছিলেন, আদালতে বলেছিলেন যে তিনি আদালতের শর্ত মেনে শ্রমিকদের কাজে পুনর্নিয়োগ করবেন। কিন্তু তিনি সে সমস্ত শর্ত লঙ্ঘন করে এখন এই কারখানার ভেতরে থাকে সব যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য কারখানা সংক্রান্ত সব কিছু বেআইনিভাবে তুলে নিয়ে চলে গেছেন। কারখানা নিলামে তোলার সময় শর্ত ছিলো যে অফিসিয়াল লিকুইডেটরের প্রস্তুত করা যন্ত্রপাতির তালিকা মান্য করতে হবে। এই তালিকা এখনও মহামান্য আদালতের হেফাজতে আছে - কিন্তু এখন কারখানার ভেতরে সেই তালিকা অনুসারে কোনো যন্ত্রপাতি নেই। যখন আদালতে এই সওয়াল চলছে, তখন বেণীর বর্তমান মালিক, শ্রী সিংহানিয়ার রত্নাগিরির

সংস্থার পক্ষের উকিল সংস্থা, জালান এ্যন্ড কম্পানি দস্তুরমতো উপস্থিত ছিলো, কিন্তু তারা হিরণ্ময় নিরবতা পালন করাই শ্রেয় বলে মনে করে। এই প্রেক্ষিতে তখন আদালত অফিসিয়াল লিকুইডেটরকে নির্দ্দেশ দেয় যে তিনি যেন শ্রমিকদের পক্ষের আইনজীবীসহ শ্রমিক প্রতিনিধিদের কারখানায় যাওয়ার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করবেন, তিনি নিজে এই প্রতিনিধিদের সঙ্গে কারখানায় গিয়ে এই অভিযোগের সরেজমিনে তদন্ত করে এপ্রিল ২০, ১৯৯৮ এ এই আদালতে আবার রিপোর্ট জমা দেবেন।

কিন্তু সিংহানিয়া সাহেব ছলাকলায় দড়। নির্দ্দিষ্ট সময় এলে দেখা গেলো যে অফিসিয়াল লিকুইডেটর শ্রমিকদের এবং শ্রমিকদের পক্ষের আইনজীবীদের জন্য আদালতকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে এঁদের যাতায়াতের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা না করে তাঁরা নিজেরা নিজেরা কারখানায় গিয়ে হাজির হন। আদালতে যখন এই বিষয়টি ওঠে, তখন অফিসিয়াল লিকুইডেটর বলেন যে তাঁরা কারখানায় গিয়েছিলেন যন্ত্রপাতি আছে কিনা তদন্ত করতে, তবে কিনা তাঁদের এই বিষয়ে রিপোর্ট দিতে এখনও দিন সাতেক সময় লাগবে, হুজুর যদি মেহেরবানিপূর্বক এই সাত দিনের সময় তাদের মঞ্জুর করেন! কিন্তু হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেন শ্রমিকদের পক্ষের উকিলরা। তাঁরা বললেন যে এই বিষয়টি আদালত-নির্দ্দেশিত পথ মেনে হয়নি, লিকুইডেটর সাহেব শ্রমিকপক্ষকে নিয়ে যায়নি এবং আদালতের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ থাকা সত্বেও লিকুইডেটর সাহেব শ্রমিকপক্ষকে না জানিয়েই কারখানা পরিদর্শনে চলে গেছে। আদালত এই বিষয়টি নিয়ে বেশ কড়া অবস্থান গ্রহণ করে এবং বলে যে, যে অফিসার এমন কান্ড করেছে তাকে যেন আদালতে উপস্থিত করা হয় এবং নির্দ্দেশ মোতাবেক তদন্ত করে সেই তদন্তের রিপোর্ট পরের দিনই, অর্থাৎ এপ্রিল ২১, ১৯৯৮ তেই আদালতে জমা করতে হবে।

মাননীয় বিচারপতি শ্রী সুজিত কুমার সিনহার নির্দ্দেশে অফিসিয়াল লিকুইডেটর, অভিযোগকারী শ্রমিকপক্ষ, বেণী বাঁচাও কমিটির আইনজীবী

এবং বেণী মজদুর ইউনিয়ানের আইনজীবী, সঙ্গে সিংহানিয়া সাহেবের রত্নাগিরি সংস্থার আইনজীবীরা সরেজমিনে একযোগে কারখানার ভেতর কী কী মাল আছে তা তদন্ত করতে হাজির হন। এই প্রতিনিধিদল সর্বসম্মতিক্রমে একটি তদন্ত রিপোর্ট দেন। এই রিপোর্টটি বেশ চিত্তাকর্ষক। প্রতিনিধিদল বলেন যে এই কারখানার মধ্যে তাঁরা দুটি বাতিল মেশিন ছাড়া আর কিছুই পাননি - কারখানার দখল নেওয়ার সময় অফিসিয়াল লিকুইডেটরর দেওয়া মেশিনের যে তালিকা সিংহানিয়া সাহেব মেনে নিয়ে ছিলেন, তার সমস্ত মাল গায়েব, এমনকি স্ক্র্যাপ ইত্যাদিও স্রেফ হাওয়া! বাস-ট্রামে সস্তায় মাল বেচার সময় যেমন বলা হয় যে ‘ এখানেই শেষ নয়‘, তেমনি আমাদেরও সেই একই কথা বলা ছাড়া গতি নেই! এক অদ্ভুত কৌশলে, প্রয়াত জাদুকর শ্রী পি সি সরকারকে ফেল মারিয়ে সিংহানিয়া কারখানার সব মালপত্র, হিসেবের খাতা, বেবাক রেকর্ড হাতসাফাই করে দেয় - কাকপক্ষীসহ হাইকোর্টের অফিসিয়াল লিকুইডেটর মহাশয়ও টেরও পর্যন্ত পায়নি। এই কারখানা কেনার শর্ত হিসেবে এই মাল গায়েব করে দেওয়া সম্পূর্ণ বেআইনী, আদালত অবমাননা ছাড়া আরও একগুচ্ছ বিষয়ে হাইকোর্টের সিংহানিয়ার এই রত্নাগিরি সংস্থাকে চেপে ধরার কথা। এছাড়াও হাইকোর্টের একথা গোচরে আসে যে ক্রেতা সংস্থা জোর গলায় ঘোষণা করেছিলো যে তারা কারখানার দখল পেলেই দ্রুত কারখানা চালু করে দেবে, এই শর্তেই তারা কারখানার দখল পেয়েছিলো - কারখানা অধিগ্রহণ করার পর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেলেও কম্পানির পক্ষ থেকে কারখানা খোলার কোনও উদ্যোগ আদৌ দেখা যায়নি। উল্টে কারখানা না খোলার জন্য যা যা করা দরকার ছিলো, তার প্রায় সবগুলোই করা হয়েছে। এই বিষয়টি হাইকোর্টের কাছে পেশ করা রিপোর্টে অফিসিয়াল লিকুইডেটরও এড়িয়ে যেতে পারেননি। এই রিপোর্টের একটি অংশে বলা আছে : কারখানা চালানোর কোনো উদ্যোগ চোখে তো পড়েইনি, বরং দেখা গেছে যে জলের পাইপ, হাই টেনশন বিদ্যুত লাইন, এমনকি কারখানার শেডের কিছু অংশও অনুপস্থিত।

পশ্চিমবাংলায় কারখানার জমিতে নিমেষেই বহুতল বাড়ি বনে যাওয়া এখন আর মোটেই বিরল ঘটনার পর্যায়ে পড়েনা, বরং আজকে এই ঘটনা গড়পড়তা পরিচিত ঘটনাই বলা চলে। সিংহানিয়াও এই খেলার একজন দক্ষ খেলোয়াড়, খেলোয়াড় হিসেবে তাঁর পারদর্শিতা প্রায় মারাদোনার কাছাকাছি বলা যায়। হাইকোর্টে যখন এই সব রিপোর্ট চালাচালি চলছে, তার প্রায় এক বছর আগেই সিংহানিয়া স্বয়ং তৎকালীন শ্রমমন্ত্রী শ্রী শান্তি ঘটক মহাশয়কে চিঠি দিয়ে জানায় যে বিভিন্ন কম্পানি বেণীর জমি প্লট হিসেবে কিনতে ইচ্ছুক - অতএব সরকার যেন সিংহানিয়াকে এই কান্ডটি করতে প্রেমপূর্বক অনুমতি দেয়। এতদিনে ঝুলি থেকে বেড়াল সশরীরে ধরাধামে অবতীর্ণ হলেন! লিখিতভাবে এমন বেআইনী প্রস্তাব দেওয়ার পরও পশ্চিমবঙ্গ সরকার সিংহানিয়ার বিষয়টি মোটেও কেন জানেন না, তা একমাত্র তাঁরাই জানেন। সরকার, সরকারের পক্ষের ট্রেড ইউনিয়ন, কেউই কিছুই জানেন না, অথচ খোদ শ্রমমন্ত্রীর নামে এই অনাচার করতে চেয়ে চিঠি এলো। এ কেমন রঙ্গ!

বেণীর কাহিনীতে পরতের আর শেষ নেই। এর পরের পর্বে আমরা বেণীর একেবারের ভেতরের পরতের কাহিনী বলে বেণী-সংহার পর্বের ইতি টানবো।